যায়যায়দিন
তারিখঃ ২২/০৩/২০২০ (পৃঃ১৩)

জলবায়ু পরিবর্তন ও খাদ্য নিরাপত্তায় গবেষণা

কৃষিবিদ এম আব্দুল মোমিন

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অসময়ে বৃষ্টি বেড়ে যাওয়ায় হঠাৎ বন্যা দেখা দিচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বন্যা ও পাহাড়ি ঢলে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ ২০১৭ সালে হাওড়ে মার্চের ২৯ থেকে এপ্রিলের ৪ তারিখ পর্যন্ত ৬২৯ মিলি মিটার বৃষ্টি হয়, যা অতীতের সবরেকর্ড ছাড়িয়েছে। ফলে বন্যা দেখা দেয়- যার ফলে এক সপ্তাহের মধ্যে ৬টি জেলার হাওড়ের শতভাগ ফসলহানি হয়। ওইসব এলাকার কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় করণীয় কী? প্রথমত, হাওড়ে বাঁধ দেওয়া ও নদী খননের মাধ্যমে পানি ঢুকতে না দেয়া বা অতিক্রান্ত পানি বের করে দেওয়া; দ্বিতীয়ত, এমন জাতের ফসল বের করতে হবেযাতে পাহাড়ি ঢল আসার আগেই ফসল হার্ভেস্ট করা যায়। কিন্তু এই দুটি সহজ কাজ নয়। কারণ হাওড়ের বৈশিষ্ট্যই এমন, বাঁধ বা নদী খনন করলেও ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে হাওড়ে পানি ঢুকলে তা আর বের করা সম্ভবনয়। অন্য একটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে প্রজনন পর্যায়ে ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে এমন স্বল্প জীবনকালের জাত উদ্ভাবন করা।

পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় ব্রি এখন পর্যন্ত ১০টি লবণ সহিষ্ণু, ৩টি খরা সহনশীল, ৩টি বন্যা সহনশীল, ২টি Tidal Submergence tolerant জাত উদ্ভাবন করেছে। এসব জাত মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের মোট লবণাক্ত এলাকার প্রায় ৩৫ ভাগ ধান চাষের আওতায় এসেছে এবং এ থেকে উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ১০%। খরাপ্রবণ এলাকায় খরাসহিষ্ণু জাতগুলো সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১২% আবাদ এলাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে যেখান থেকে উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৮%। জলমগ্নতা সহনশীল জাতগুলো সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২৬% এলাকা চাষের আওতায় এসেছে যেখানে উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৯%। উপকূলীয় এলাকায় ধানের আবাদ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উদ্ভাবিত জোয়ার-ভাটা সহনশীল জাত (ব্রি ধান৭৬, ৭৭) সম্প্রসারণের ফলে প্রায় ৫৭০০০ হেক্টর জমি এই ধান চাষের আওতায় এসেছে। সর্বোপরি, ঘাত সহনশীল ও অনুকূল পরিবেশ উপযোগী জাতগুলোর আবাদ সম্প্রসারণের ফলে ২০১০-১৯ পর্যন্ত গড়ে ৬.০ লাখ টন হারে চালের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। অথচ আবাদি জমির পরিমাণ প্রতি বছর কমছে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রায় ১৬.৫০ কোটি জনসংখ্যার বিপরীতে খাদ্য উৎপাদন হয়েছে ৩ কোটি ৮৭ লাখ মেট্রিক টন।

বিগত ৪৯ বছর ধরে ব্রি এ দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে অসামান্য অবদান রেখে চলছে। ১৯৭০-৭১ সালে দেশের ৭ কোটি ১১ লাখ জনসংখ্যার বিপরীতে চালের উৎপাদন ছিল এক কোটি ১০ লাখ মেট্রিক টন মাত্র। খাদ্যের জন্য আমরা ঐতিহাসিকভাবেপরনির্ভশীল ছিলাম। ১৯৯৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত তিন দলের সরকার সার এবং জ্বালানি তেলের দাম কমানো, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, কৃষিতে প্রণোদনা প্রদান, সার বিতরণ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, দেশে হাইব্রিড ধানের প্রবর্তন, ব্রি ধান২৮, ২৯ এর ব্যাপক সম্প্রসারণ, ধানের উন্নতমানের বীজ সরবরাহ, সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ব্যবস্থাসহ ইত্যাদি নানামুখী কৃষকবান্ধব পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে ১৯৯৯ সালে দেশ প্রথমবারের মতো খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রদান করা হয় জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃক মর্যাদাপূর্ণ সেরেস পদক। ২০০১ সালের পর দেশ আবার খাদ্য ঘাটতিতে পড়ে।

আবার ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে যখন দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করেন তখন খাদ্য ঘাটতি ছিল ২৬ লাখ মেট্রিক টন। তাই সরকার গঠন করেই তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনে। প্রথম ক্যাবিনেট সভায় সারের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নেন। যেখানে ৮০ টাকার টিএসপির মূল্য ২২ টাকা ও ৭০ টাকার এমওপির মূল্য ১৫ টাকায় নামিয়ে এনে সুষম সার ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানোর পদক্ষেপ নেন। এ ছাড়া কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ভর্তুকি প্রদান, ১০ টাকায় কৃষকের জন্য ব্যাংক হিসাবচালুকরণ, সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, কৃষিতে প্রণোদনা প্রদান, সার বিতরণ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলশ্রুতিতে ২০১৩ সালে এসে দেশ শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতাই অর্জনই করেনি, খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ এবং ২০৪১ এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্রি ইতোমধ্যে Rice Vision-২০৫০ প্রণয়ন করেছে- যা থেকে দেখা যায়, বর্তমান বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের জনসংখ্যা সাড়ে ২১ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। রাইস ভিশনে বলা হয়েছে, উৎপাদনের গতিশীলতা অব্যাহত থাকলে ২০৩০, ২০৪১ এবং ২০৫০ সালে চালের উৎপাদন হবে যথাক্রমে ৪০, ৪৪ এবং ৪৭ মিলিয়ন টন। বিপরীতে ২০৩০, ২০৪১ এবং ২০৫০ সালে যথাক্রমে ১৮৬, ২০৩ এবং ২১৫ মিলিয়ন লোকের খাদ্য চাহিদা পূরণে চাল প্রয়োজন হবে যথাক্রমে ৩৮.৫, ৪২.০ এবং ৪৪.৬ মিলিয়ন টন। Ultimately ২৫ কোটি মানুষকে খাওয়ানোর টার্গেট নিয়ে ব্রি বিজ্ঞানীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রাইস ভিশন বাস্তবায়নের পাশাপাশি ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে একটি স্ট্র্যাটেজিক প্লান তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, ক্রমহ্রাসমান প্রাকৃতিক সম্পদ (যেমন-কৃষি জমি, পানি, কৃষি শ্রমিক এবং মাটির উর্বরতা) এবং বৈশ্বিক আবহাওয়া পরিবর্তন। দেশে ধানের জমির পরিমাণ প্রতি বছর ০.৪০% হারে কমে যাওয়ার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসবচ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্রি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। এর মধ্যে রয়েছে- প্রতি বছর ৪৪ কেজি/হেক্টর হারে জেনেটিক গেইন বাড়ানো, কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ১% হারে ফলন পার্থক্য ও জাতগুলোর সম্প্রসারণে দীর্ঘসূত্রিতা কমানো, আউশের কভারেজ বৃদ্ধি করে ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা পূরণ করেও ২০৩০, ২০৪১ এবং ২০৫০ সালে যথাক্রমে ১৯ লাখ, ২১ লাখ এবং ২৬ লাখ টন উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব।

সরকারের পরিকল্পনায় আমাদের কৃষি ক্রমশ দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণে শিফট হচ্ছে। উৎপাদন বাড়াতে হলে দক্ষিণাঞ্চলের অলবণাক্ত এলাকায় ধান চাষ সম্প্রসারণ করতে হবে। সেই অনুযায়ী দক্ষিণের বিভিন্ন নদী যেমন- তেঁতুলিয়া, পায়রা, কীর্তনখোলার মিষ্টি পানি ব্যবহার করে ধানের আবাদ এলাকা কিভাবে সম্প্রসারণ করা যায় সে ব্যাপারে আমাদের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। লবণাক্ততা সহনশীল জাতের পাশাপাশি নতুন সেচের উৎস তৈরি হলে দক্ষিণাঞ্চলে ধান চাষের এলাকা সম্প্রসারিত হবে। যেমন- বিআর২৩, ব্রি ধান৩০, ব্রি ধান৫২, ব্রি ধান৬৭, ব্রি ধান৭৬, ব্রি ধান৭৭ এবং ব্রি ধান৮৭ দক্ষিণের চর এলাকাসহ বিশাল অনাবাদি এলাকা ধান আবাদের আওতায় এসেছে।

দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির অধিকাংশ ক্যালরি, প্রোটিন ও মিনারেল আসে ভাত থেকে। ভাত তাদের কাছে সহজলভ্য। সাধারণ মানুষ দুধ-ডিম ও মাংসসহ অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার কিনতে না পারলেও ভাত নিয়মিত খেতে পারছে। তাই ভাতের মাধ্যমে কিভাবে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করা যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করছেন আমাদের বিজ্ঞানীরা। চাল ছেঁটে যাতে চালকে অনিরাপদ করতে না হয় সেজন্য ব্রি ইতোমধ্যে প্রিমিয়াম কোয়ালিটিসম্পন্ন জাত যেমন- ব্রি ধান৫০, ব্রি ধান৬৩, ব্রি ধান৭০, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৮০, ব্রি ধান৮১, ব্রি ধান৮৪, ব্রি ধান৮৬, ব্রি ধান৮৮ এবং ব্রি ধান৯০ উদ্ভাবন করেছে। এসডিজিকে সামনে রেখে ব্রি বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে দুটি জিংকসমৃদ্ধ জাত উদ্ভাবন করেছে, পাশাপাশি অন্যান্য পুষ্টি উপাদান যেমন- প্রোটিন, আয়রন, এন্টি-অক্সিডেন্ট, গাবা ও বিটা ক্যারোটিনসমৃদ্ধ জাতসহ বিভিন্ন পুষ্টিকর ধান উদ্ভাবন করেছে। এ ছাড়া শরীরের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যোপাদানগুলো দেহের প্রয়োজন অনুসারে চালে সংযোজন, সরবরাহ বা পরিমাণে বৃদ্ধি করে উদ্ভাবনকৃত জাতগুলো অব্যাহতকরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কৃষিকে টেকসই ও বহুমাত্রিকীকরণে জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮-তে কৃষি উন্নয়নে ন্যানোপ্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জাত উদ্ভাবন, রোগবালাই দমন, সার ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে। ধানের উৎপাদন ও রোগ বালাই দমনে ফার্টিলাইজার ও ন্যানোপেস্টিসাইডের প্রভাবনিয়ে ব্রিতে গবেষণা চলছে।

(নিবন্ধটি সম্প্রতি ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরামের জলবায়ু পরিবর্তন ও ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মশালায় ব্রি মহাপরিচালকের প্রদত্ত বক্তব্য থেকে সংকলিত)।